পায়ে দাঁড়াতে পারে। কথাটা শুনে আশরাফ যেন একটু হোঁচট খেল। 'নিজের পায়ে দাঁড়াব!' কথাটা যেন একটু অন্যরকম শোনাল। হঠাৎ বাবা এই কথা বলতে গেল কেন? সন্দেহের চিহ্ন হিসেবে সামান্য ভ্রূ কুঁচকালো আশরাফ। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন থেকে সন্দেহের রেখা মুছে গেল তার মায়ের ডাকে। মা খেতে ডাকছে। ডাক শুনে শফিক সাহেব বললেন– আর হয়তো গল্প করা চলবে না। চল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। কাল স্কুলে যেতে হবে তো'। আগে কখনো ছেলেকে স্কুলের কথা বলেননি। কিন্তু আজ তিনি কেন যে কথাটা বলে ফেললেন, তিনি নিজেও জানেন না। শুধু মনে হতে থাকে এটাই হয়তো তার ছেলের সাথে শেষ কথা।

এদিকে স্ত্রী বুশরাও মনটাকে স্থির করতে পারছেন না। কেন জানি শুধু অস্থির অস্থির লাগছে। এদিকে বুশরার নজরে পড়ে একটু পরপরই স্বামী এটা ওটা করে দিতে বলছে। এ রকম তো আগে কখনো হয়নি। তার ওপর কথায় কথায় কখনো শব্দের ব্যবহার তাকে আরও সন্দেহপ্রবণ করে তুলছে। ক্রমেই তার মনের মধ্যে সন্দেহের মেঘ দানা বাঁধ থাকে। রাতে বারোটার পর ঘুমাতে যায় সবাই। ঘুমোতে গিয়েও শান্তি পায় না বুশরা। মনের মধ্যে কালবৈশাখী সৃষ্টি হতে থাকে। কিছুতেই যেন চোখে ঘুম আসছে না। এপাশ-ওপাশ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়ল বুশরা নিজেও তা বুঝতে পারেনি।

মাঝরাত। বুশরার মনে হলো একজন লোক তার হাত ধরে আছে। লোকটার চেহারা আবছা হলেও বুশরা বুঝতে পারে এ তার চির পরিচিত কেউ। হঠাৎ তার মনে হতে লাগল এ শক্ত হাতের বাঁধন যেন ধীরে ধীরে আলগা হতে থাকে। বুশরা হাতটা আরও জোরে চেপে ধরে রাখার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। এক সময় হাতটা বুশরার নাগালের বাইরে চলে যায়। আবছা চেহারার লোকটাও ধীরে ধীরে সরে যেতে থাকে পিছনের দিকে। বুশরা শত চেষ্টা করেও গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বের করতে পারে না। এক সময় সে লোকটাকে আর দেখতে পায় না। সামনে শুধুই অন্ধকার আর অন্ধকার।

এরকমই এক দুঃস্বপ্নে ভোর পাঁচটার দিকে ঘুম ভেঙে যায় বুশরার। অজানা আশঙ্কায় বুক ছটফট করতে থাকে। কিছু না ভেবেই স্বামীর হাতটা ধরে ফেলে বুশরা। শীতল হাতের স্পর্শেত বুশরার শরীরটা ঝনঝনিয়ে উঠল। হাতটা ঠাণ্ডা কেন? বুকের ওপর হাত রাখে, নাড়ির স্পন্দন পর্যবেক্ষণ করে। সে বুঝতে পারে না ফেরার দেশে চলে গেছে তার স্বামী। কোনো চিৎকার না দিয়েই আশরাফকে ডেকে বলে– আশরাফ ওঠ। বাবাকে শেষ বিদায় জানিয়ে দাও। মায়ের এরকম কথায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে দেখতে পায় বাবার মৃত দেহ। ও দেখতে পায় বাা যেন কোথাও একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। চোখের পাতা নড়ে না। শুধুই তাকিয়ে আছে। কাঁপা কাঁপা হাতে স্বামীর চোখ বন্ধ করে দেয় বুশরা। মুখ দিয়ে কোনো কথা বের করতে পারছে না। শুধুই অবিরাম ধারায় পড়ছে চোখের পানি।

বিকালে জানাযা দিয়ে শফিক সাহেবের দাফন কার্য সমাধা হলে বাড়ি থেকে একজন একজ করে লোক চলে যেতে থাকে। কিন্তু থেকে যায় আশরাফের দুই চাচা আর চাচি। পরদিন রাতের বেলা শফিক সাহেবের কোম্পানি ও আশরাফের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনায় বসে সবাই। বুশরা কোম্পানির দায়িত্বটা দিয়ে দেয় আশরাফের চাচাদের উপর। কোনো আপত্তি না করেই তারা কোম্পানির ভার নিয়ে নেয়।

আকাশের চাঁদ যেন হাতে পেয়েছে! সাত মাস পর। একদিন আশরাফের মেজ চাচা আসে বুশরার সই নিতে। কিসের সই জিজ্ঞাসা করলে চাচা বলে কোম্পানির স্বার্থেই সইটা দরকার। আর শফিক ভাই না থাকায় সবাই এখন আপনার সইটা চায়। বুশরার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না। সঙ্গে সঙ্গে সে সইটা করে দিল। কিন্তু বুশরা বুঝতে পারেনি যে, এভাবে সে নিজের কত বড় একটা বিপদ ডেকে এনেছে। প্রায় দুই মাস পেরিয়ে গেলে হঠাৎ একদিন মেজ চাচা এসে উপস্থিত। বলে– বাড়ি খালি কর। তানাহলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। বুশরা কিছু বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করে– বাড়ি কেন খালি করব। বাড়িটা তো আমারই। আর এ বাড়ি ছেড়ে আমি যাবই বা কোথায়। কোনো কথা না বলে চাচা বুশরাকে দেখায় যে, সইটা বুশরা প্রায় দুই মাস আগে করেছিল। মিথ্যে বলে বাড়িটা দখল করে নিয়েছে ওরা। সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝতে পারে যে কোম্পানির লোকসানের পেছনে এদেরই হাত ছিল। প্রতিবাদ করতে গেলে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় ওজের দুজনকে। সবে মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র আশরাফ। কিন্তু এ অঙ্কুরিত অবস্থাতেই বুশরা চায় না তার ছেলের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে দিতে। স্বামীর ইচ্ছাকে যে তাকে পূরণ করতেই হবে। এমন দৃঢ় প্রত্যয়ে অজানা ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায় বুশরা।

ছোট একটা ঘর। মেশিনের ঘর্ ঘর্ আওয়াজ। মা বসে বসে জামা সেলাই করছে। পাশেই মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করছে আশরাফ। সামনে এসএসসি পরীক্ষা। ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় মারা যায় ওর বাবা। শফিক সাহেবের কোম্পানির এক পুরনো কর্মচারীর সহায়তায় ব্যাংক থেকে কয়েক হাজার টাকা ঋণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনে বুশরা। জামা সেলাই করেই দিন কাঁটাতে হচ্ছে তাকে। হঠাৎ একদিন বুশরা শুনতে পায় ঐ কর্মচারীও মারা গেছেন। এতদিন তিনি তাদের উপর ছায়া হয়েছিলেন। বুশরা বুঝতে পারে আশরাফ ছাড়া এখন ওর আপন বলতে আর কেউ নেই। একা হাতেই সামলাতে হবে সব। এসএসসিতে গোল্ডেল A^+ পেয়ে মায়ের জমানো টাকায় একটা ভালো কলেজে ভর্তি হয় আশরাফ। চলতে তাকে পড়াশোনা। ওর ফলাফল বরারই খুব ভালো। কিন্তু খরচ বাড়তে থাকে। কয়েক মাস পেরিয়ে যাবার পর অর্থসঙ্কটে পরতে হয় বুশরাকে। বিষয়টি আশরাফের নজর এড়ায় না। কিন্তু ওরই বা কী করার।

কলেজের সেরা ছাত্র হিসেবে আশরাফের খুব নাম ডাক ছিল বলে কলেজের প্রধান অধ্যক্ষের প্রিয় ছাত্র হিসেবে পরিচিত ছিল আশরাফ। আশরাফের অর্থসঙ্কটের বিষয়টি প্রধান অধ্যক্ষের নজরও এড়াতে পারেনি। একদিন তিনি বুশরাকে ডেকে অনুরোধ করলেন আশরাফকে বিনা বেতনে পড়ানোর জন্য। কিন্তু বুশরা ছেলের আত্মসম্মানের কথা ভেবে প্রথমে না বললেও অধ্যক্ষের জোর অনুরোধে তাকে রাজি হতে হলো। তবে অধ্যক্ষ আশ্বাস দিলেন যে, এ ব্যাপারটা শুধুমাত্র বুশরা ও অধ্যক্ষ ছাড়া আর কেউ জানবে না। এমনকি আশরাফও না। কারণ, বিষয়টি জানতে পারলে ও নিজেই পড়াশোনা ছেড়ে দেবে। আর কলেজের অধ্যক্ষও চান না এমন মেধাবী ছাত্রকে হারাতে।

জ্যোৎস্না রাত। আকাশে উঠেছে পূর্ণিমার চাঁদ। যেন একটি রূপার থালা। চাঁদের আলোতে আকাশের তারাগুলো মিটিমিটি করে জ্বলছে আর লুকোচুরি খেলছে। মুগ্ধ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ার আশরাফুল ইসলাম। প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগে এমনই এক পূর্ণিমার রাতে বাবার সাথে শেষ কথা হয় আশরাফের। এইচএসসি পরীক্ষার সময় বাড ক্যান্সারে মারা যায় ওর মা। আশরাফ বলেছিল পরীক্ষা শেষ হলেই রোজগার করে মায়ের চিকিৎসা করাবে। শরীর ভালো ছিল না বলে কোনোদিনই মায়ের সাথে যেতে পারেনি পরীক্ষার হলে। শেষ পরীক্ষার দিন বের হওয়ার সময় মা বলেছিল– 'সাবধানে যেও, ভালো থেকো।' কথাটা শুনে থমকে দাঁড়ায় আশরাফ। ঘুরে দাঁড়ালে মা হাত নাড়িয়ে বিদায় জানায়। পরীক্ষার হলে চলে যায় ও। পরীক্ষা দিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখে তার মা আর নেই। মাও চলে গেলে পরপারে।

এসব ভাবতে ভাবতে ওর চোখের কোনে পানি চলে আসে। বাবা-মায়ের শেষ কথাগুলো আজও ওর কানে নূপুরের আওয়াজের মতো বাজে। এক সময় ওর কাছে টাকা ছিল না বলে মায়ের চিকিৎসা করাতে পারেনি। কিন্তু আজ ওর কাছে টাকা থাকা সত্ত্বেও মা নেই। মাও যে বাবার মতো ওকে না বলে চলে গেছে না ফেরার দেশে। বাবা-মা দুজনেরই স্বপ্নই তো পূরণ হলো। কিন্তু ওর স্বপ্নটাকে পূরণ করবে। ওর স্বপ্নটা কি তবে অপূর্ণই রয়ে যাবে? ওর স্বপ্নটা কি কোনোদিনই পূরণ হবে না? আজ ও খুবই একা। ওকে সান্ত্বনা দেয়ার আজ যেন কেউ কেউ। ও বুঝতে পারে বুকের ভেতর এক বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। যার ভেতর শুধুই শূন্যতা।

শেফালী ও আলোর পরী

ফারহানা আক্তার
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ২৯
শাখা : ক, বিভাগ : বিজ্ঞান
শিফট : প্রভাতী

রাত নেমে এসেছে। পুরনো জমিদারবাড়ির দিঘির পাড়ে মাঝারি ধরনের একটি শেফালি ফুলের গাছ। বেশ কয়েকটি ফুল ফুটেছে। জোছনা এসে পড়েছে ফুলগুলোর ওপর। ছোট ছোট ডাল আর ফুল পাতার দুলুনিতে আলোছায়ার লুকোচুরি বেশ জমে উঠেছে। যেন ফুলগুলোর ওপর মনের আনন্দে নাচতে শুরু করেছে জোছনার আলো। তা দেখে একটি ফুল জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কারা? জোছনা বলল, আমরা চাঁদের মেয়ে। আমাদের নাম জোছনা। ফুলগুলো অবাক হয়ে বলল, চাঁদ তো অনেক দূরে থাকে। তোমরা কি করে এখানে এলে? জোছনা বলল, আমরা তিন লাখ একাশি হাজার পাঁচশ কিলোমিটার দূরে থেকে তোমাদের পৃথিবীতে এসেছি। এ কথা শুনে ফুলগুলোর চোখ তো চড়কগাছ। একটি ফুল জিজ্ঞাসা করল, আমরা তো বুঝতে পারছি না। এতদূর থেকে তোমরা কী করে এলে? জোছনা হাসতে হাসতে বলল, আমরা আলোর পরী। আমাদের অনেক গতি, এক সেকেন্ডে আমরা তিন লাখ কিলোমিটার যেতে পারি। পৃথিবীতে আসতে আমাদের দেড় সেকেন্ডরও কম সময় লাগে।

ফুলগুলো যেন আরো অবাক হয়ে গেল। কিছুক্ষণের নীরবতা ভেঙে জোছনা বলল, তোমরা তো দেখতে খুব সুন্দর। তোমাদের নাম কী? দুই-তিনটা ফুল একসঙ্গে বলে উঠলো, আমাদের নাম শেফালি। তোমরা কি আমাদের বন্ধু হবে? জোছনা বলল, অবশ্যই। এখন থেকে আমরা তোমাদের বন্ধু। তাহলে তো ভালোই হলো।

হ্যাঁ আমরা নিয়মিত পৃথিবীতে আসি। তোমাদের পৃথিবী অনেক সুন্দর। কী সুন্দর মাঠ, ধানক্ষেত, পাহাড়, সমুদ্র, বনবনানী। আমাদের খুব ভালো লাগে।

শেফালি ফুল জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের চাঁদে কি আছে বন্ধু?

জোছনা বলল, চাঁদে শুধু বালি আর কাঁকড়, কোনো গাছপালা নেই। বাতাস নেই। চাঁদের নিজস্ব কোনো আলোও নেই। তাহলে তোমরা এলে কেথা থেকে?

জোছনা বলল, আমরা এসেছি সূর্যের আলো থেকে। সূর্যের আলো চাঁদের ওপর গিয়ে পড়ে। সেই আলোর প্রতিফলন থেকে আমাদের জন্ম হয়। সব ফুল এবার একসাথে বলে উঠল তা-ই? রাত অনেক গভীর হয়ে গেছে। চাঁদ পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। এমন সময় একটা ঝটকা এলো বাতাসের। সঙ্গে সঙ্গে শেফালি ফুলগুলো চেঁচিয়ে উঠল জোছনা বলল, কী ব্যাপার তোমরা কি ভয় পেয়েছে? একটি বয়স্ক শেফালি বলল, হ্যাঁ আমাদের ঝড়ে পড়ার সময় এসে যাচ্ছে। বলেই ফুলটি কান্না শুরু করে দিল। একটি ফুল মুখ ভার করে বলল, কিছুক্ষণের মধ্যেই ভোর হবে। তার আগেই আরা ঝড়ে যাব। কথাগুলো শুনে জোছনার খুব মন খারাপ হয়ে গেল। একটি ফুল বলে উঠল সারারাত বন্ধ বিলিয়ে খুব ভোরে ঝরে যাওয়াই আমাদের নিয়ম। কথা শেষ না হতেই কোথা থেকে একটি দোয়েল এসে বলল ডালে। অমনি রাখারর ঝাপটায় পাঁচ-ছয়টি ফুল গেল ঝরে। আর মাত্র দুতিনটি ফুল রইল। বাতাস এসে তারাও যেন ঝড়ে পড়বে। চাঁদ তখন ডুবুডুব করছে। ঝরে যাওয়া শেফালিদের জন্য আলোর পরীদের মন তখন ভীষণ খারাপ।

আজব কাহিনী

নুসরাত জাহান
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ৫৫
শাখা : ক, (বিজ্ঞান),
শিফট : প্রভাতী

আমাদের সৌরজগতে আটটি গ্রহ আছে। তার মধ্যে পৃথিবী একটি গ্রহ যেখানে সকল প্রকার উচ্চ বা নিম্ন প্রকৃতির প্রাণী বসবাস করে। আমরা এই পৃথিবীতে মানুষ হয়ে জন্মেছি কিন্তু এই সকল মানুষকে ভেদাভেদ করে এই পৃথিবীর মানুষেরাই উচ্চ-নিম্নবংশ পরম্পরায় বা জাতি, বর্ণ বা ধর্মের বিভেদের করে যেমন : এ পৃথিবীতে রকম মানুষ আছে যার মধ্যে কেউ কেউ অফিসের বস, অফিসের কর্মচারী, কেউ ব্যবসায়ী। বিভিন্ন রকম পেশায় নিয়োজিত। কেউ কেউ এসি রুমে বসে তার অফিসের কর্মচারী বা কাজের সহকারীকে আদেশ করে তারা দেরি করে ঘুম উঠে কিন্তু যারা কাজ করে তারা সকালে উঠে ঘুম থেকে। আবার কেউ পায়ের ঘাম

মাথায় ফেলে সারাদিন কায়িকশ্রম করে মাথা গোঁজার ঠাই খোঁজে আবার কেউ কেউ গাড়িতে চলে আবার কেউ রিকশায় আবার কেউ এই সরে চড়ার অর্থই থাকে না। তাই তারা পায়ে হেঁটে চলে আবার কেউ কেউ খাচ্ছে বিরিয়ানি, মাংস, পোলাও এবং যা বেঁচে যাচ্ছে তা ফেলে দিচ্ছে। কেউ আবার খায় ভাত, মাছ, মাংস, ডাল। আবার কেউ কেউ পান্তা ভাত খাচ্ছে লবণ ছাড়া। আবার কেউ কেউ পাচ্ছেই না। তারা এক মুঠ খাবারের জন্য অন্যের মুখের পানে চেয়ে থাকে। আবার মুসলিম দেশে হিন্দুদের অত্যাচার যেমন মন্দির ভেঙ্গে দেয়া, আবার হিন্দু দেশে মুসলিম ও অন্যান্য ধর্মের মানুষরে অত্যাচার যেমন : মসজিদ ভাঙ্গা, মঠ ভাঙ্গা, গির্জা ইত্যাদি পবিত্র স্থান ভাঙ্গা। আবার হিন্দু ধর্মের মধ্যে জাতের ভেদাভেদ ব্রাহ্মণ, ঘোষ, দাশ, ভদ্র, পাল, কুমার ইত্যাদি যাদের মধ্যে এক প্রকার লড়াই হয়। মূলকথা তার একঘাটে জলপান করে না একই জাতের বা বংশের না হলে। আবার অনেক পরিবার যৌথ আবার অনেকে একক। কতরকম পরিবার আছে যেখানে ছেলেকে বেশি প্রাধান্য আবার কত জায়গায় সমান। কিন্তু আমরা যখন জন্মগ্রহণ করি তখন সকল পরিবারই চাই তার সন্তানকে শিক্ষিত করতে কিন্তু সবাই পারে না তার আর্থিক অবস্থার জন্য। তারপরে কথা বলা যাক যারা পড়ালেখা শিখছে কিন্তু একটাকে শেখা বলা উচিত না, কারণ এটাকে শেখা বলে না– এটাকে বলে হিংসা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কারণ আমাদের শিক্ষা জীবনে শিক্ষার ফলাফল জানার জন্য শিক্ষকরা তৈরি করে পরীক্ষা। এই পরীক্ষাই হয়ে গেছে প্রতিযোগিতা, হিংস্র ও অহংকারের জন্য দায়ী। সকল ছাত্র-ছাত্রীরাই এই পরীক্ষাকে শেখার ফলফল মনে না করে সকলেই মনে করে কে কার আগে যেতে পারবে। কেউ যদি প্রথম স্থান বা যাকে বলে প্লেজ অধিকার করে তখন তার অহংকার বেড়ে যায় তখন সে ধরাকে সরাজ্ঞান মনে করে এবং তার প্রিয় বন্ধুদের সাথে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে এই অহংকার। তাই এই ভালো ফলাফলের জন্য সবাই বিভিন্ন টিউশন বা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে যায় আর সেখানে যা শেখায় তাই আমরা পরীক্ষায় লিখি। অর্থাৎ যা খাওয়ানো হয় সেটাই বমির মতো করে সব বের করে দেওয়ার কারণ। আমাদের যদি বলা হয়, পৃথিবীটা গোল তবে আমরা তাই বুঝি যদি বলা হয় $(a+b)2 = a^2+2.a.b+b^2$ আমরা তাই বুঝি। কিন্তু আমরা কখনো যুক্তি দিয়ে কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করি না। বিজ্ঞানী নিউট্রনের যেমন আপেল পড়ার ঘটনাকে যুক্তি দিয়ে এই ঘটনার প্রমাণ করেছে। আমরা তা করি না, সে তার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েছিল। কিন্তু আমরা আমাদের জ্ঞানকে কাজে না লাগিয়ে আমাদের জ্ঞানকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছি। আবার Tomas alva edison পিছনের ছাত্র হয়েও তাঁর জ্ঞানকে উপলব্ধি করে বৈদ্যুতিক বাল্ব তৈরি করেছেন। আমরা এমন চেষ্টা না করে, এই পরীক্ষার প্রতিযোগীর নেশায় কোচিং করে, জ্ঞানকে উপলব্ধি না করে গুলি খেয়ে নেয়। আর এটাই হয়ে গেছে ছাত্র-ছাত্রীদের জীবন। ছাত্র-ছাত্রী মানে কাঁধে তুলে নেয় একগাদা বইয়ের বোঝা। ডেমোক্রেসি এসেছিল ভালোর জন্য তাকে জনগণ একে রূপ দিল খারাপের দিকে ঠিক তেমনিভাবেই এই পরীক্ষা এসেছিল ভালোর জন্য। তাকে ছাত্র-ছাত্রীরা বানিয়ে দিল খারাপ। এভাবে সব ভালোর দিক হয়ে যায় খারাপ দিক। আর অপর দিকে যারা পড়ালেখা করতে পারে না তারা অপমানিত হয় হাজার হাজার মানুষের কাছে। তাহলে কি বলা যায় না আমাদের পৃথিবীটা আজবও! আর এটাই আজব পৃথিবী?

অন্য বই

জয়িতা ধর
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ৪৯
শাখা : খ, শিফট : প্রভাতী

আমাদের অনেকেই কম-বেশি বই পড়তে আগ্রহী, কৌতূহলী। তবে বইয়ের মধ্যে নানা তারতম্য করা যায়। সেই বই হতে পারে– উপন্যাস, ছোট গল্প, বিভিন্ন সময়ের কবিদের লেখা কাব্যগ্রন্থ প্রভৃতি। তবে আমার পছন্দের বই তালিকায় আমি অন্তর্ভুক্ত করেছি রহস্য, গোয়েন্দা, অভিযানমূলক বই, যা আমাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের কৌতূহল। নতুন কিছু শেখার আগ্রহ, জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তোমরা হয়তো কখনো নাম শোননি, বিশ্ব সাহিত্যে যিনি প্রথম গোয়েন্দা ভিত্তিক গল্প লেখেন। তিনি হলেন এডগার এল্যান পো। তার জন্ম ১৯ জানুয়ারির ১৮০৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮২৭ সালে তিনি মাত্র ১৮ বছর বয়সে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। সে বছরই তার প্রথম আন্তঃপ্রকাশ ঘটে একটি কবিতার বইয়ের মাধ্যমে। যে বইটির নাম 'Po and other poems' তারই হাত ধরে বিশ্ব-সাহিত্যে আসে আধুনিক গোয়েন্দা চরিত্র অগোস্তক পা। তার অনুপ্রেরণায় স্যার অ্যারথার কোনন ডয়েল লেখেন সার্লক হোমস, স্বরনিন্দু বন্দোপাধ্যায় লেখেন সত্যের অন্বেষণকারী ব্যক্তিত্ব বোমকেষ বক্সী, মহান পরিচালক, লেখক সত্যজিৎ রায় ও হুমায়ূন আহমেদ লেখেন যথাক্রমে ফেলুদা। মিসির আলী, এটা তো হলো গোয়েন্দাভিত্তিক বইয়ের আলোচনা, এবার আসি কিশোর-কিশোরীদের রহস্য, অভিযানমূলক গল্পের বইয়ের প্রসঙ্গে। আসল ব্যাপার হলো বিংশ শতাব্দীর কিশোর-কিশোরীরা একটি বড় অংশ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ব্যস্ত সময় পার করে। তবে তাদের মধ্যে ছোট এক পড়ুয়া জনগোষ্ঠী বই পড়তে ভীষণ আগ্রহী। তাদের অন্যান্য বইয়ের প্রতি কৌতূহলী আবেগটি থাকে। রহস্য, অভিযানমূলক বইয়ের মধ্যে আমার প্রিয় Hop frog, নন্দনগড় রহস্য, গুপ্তধন, রানী যখন খুনি, চাঁদের পাহাড়, ময়ূরকণ্ঠী, জেলি, নখোদর্পণ, ঈশ্বরের নয় লক্ষ কোটি নাম। Spotlight, শূন্য শুধু শূন্য নয়, অনুকূল, প্রাগজ্যোতিষ্ক, The Borown hand, ব্রাজিলের কালো বাঘ, চুয়াচন্দন, আরও অসংখ্য বই। একটা সত্য যে, পাঠ্যবই আমাদের জ্ঞান বাড়ায়। তবে পাঠ্য বইয়ের বাইরের জগতে নিজেকে বিকশিত করার জন্য, নিজেকে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন বইয়ের ভূমিকা অপরিসীম। তাই নিজেকে সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে তুলতে 'অন্য বই'-এর জুড়ি নেই।

স্বল্প সুখের গল্প

অর্পা পাল
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ০১
শাখা : ক, শিফট : দিবা

এক বাগানে একটি গোলাপ গাছ ছিল। সেই গোলাপ গাছটির পাশেই ছিল একটি অমরত্ব গাছ দুজনের পাশাপাশি বেড়ে উঠেছিল। আর দুইজনের মধ্যে ভীষণ বন্ধুত্ব। একদিন অমরত্ব গাছটি গোলাপকে ডেকে বলল, ভাই গোলাপ, তুমি কি সুন্দরই না দেখতে! আর তোমার সুগন্ধে মনটা ভরে যায় আমার। তুমি মানুষ ও দেবতা সকলেরই প্রিয়। তোমাকে আমি অভিনন্দন জানাই। গোলাপ তখন মৃদু হেসে বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। তবে আমার এই জীবন অতি ক্ষণস্থায়ী। আর গাছ থেকে আমাকে কেউ না ছিঁড়লেও আমি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে যাই। অথচ তুমি কেবলই বিকশিত হও। তুমি এখনও যেমন পরেও ঠিক তেমনই থাকো। আমার মনে হয় স্বল্পকাল বিলাস সুখ ভোগ করে মৃত্যুর কবলে পড়ার চেয়ে অতি অল্পে সন্তুষ্ট থেকে দীর্ঘকাল শান্তিতে বেঁচে থাকা অনেক ভালো। নীতি স্বল্প সুখের চেয়ে সুদীর্ঘ শান্তির জীবন অনেক ভালো।

ভূতের গল্প
অদ্ভুত আঁধার

সাদিয়া ইসলাম
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০১
শাখা : ক, শিফট : দিবা

আমার আব্বুর সরকারি চাকরির কারণে প্রতিবছর তাকে বিভিন্ন জেলায় বদলি করা হয়। তাই প্রতি বছর আমাকে ও আমার বোনকে নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হয়। নতুন জায়গা, নতুন স্কুল, নতুন বন্ধু। প্রথম প্রথম আমার ভালো লাগত না। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। এ বছর আব্বুকে বদলি করা হলো সুনামগঞ্জে। হাওড় এলাকা বলে এখানে যাতায়াত ব্যবস্থা খুব খারাপ। বর্ষাকালে নৌকা একমাত্র চলাচলের মাধ্যম। চারদিকে শুধু পানি আর পানি। আমরা যে বাসাটায় উঠেছি সেটা পুরনো জমিদার বাড়ি। জমিদারি প্রথা তখন নেই তাই বাড়িটা সরকারি সম্পত্তি হিসেবে জমা হয়েছে। বিশাল বাড়ি। সামনে হাওড়। যতদূর চোখ যায় শুধু পানি ছাড়া কিছু দেখা যায় না। আমাদের এ নতুন বাড়িটাকে আমার কাছে সমুদ্রের মাঝে একটি দ্বীপ মনে হলো। বাড়িটা দোতলা। ছাদ থেকে হাওড় দেখা যায়। দূরে নৌকায় করে মাঝিরা মাছ ধরে আমি সারাদিন বসে এসব দেখি। কখনো ঝাঁক বেঁধে পাখিরা উড়ে যায় পানির ওপর দিয়ে। আমার খুব পাখি হতে ইচ্ছে করে। বাড়িটা আমার খুব পছন্দ হলো। আমার ছোট বোন তিথিরও পছন্দ হলো। আমরা দুজন সারাদিন ছাদে খেলাধুলা করি আর হাওড় দেখি। বাড়িটা আব্বুরও পছন্দ হলো। পছন্দ হলো না শুধু আম্মুর। আব্বুকে আম্মু প্রায়ই বলতো এ বাড়িটার দোষ আছে। বাড়িটা খারাপ। আমি বুঝতাম না বাড়ির আবার দোষ কিসের! বাড়িতো বাড়ি। আমরা দুভাইবোন যখন ঘুমিয়ে পড়তাম আম্মু-আব্বাকে বলতো এ বাড়িটা তার ভালো লাগছে না। কেমন গা ছমছমে ভাব। আব্বু হেসে বলতো তুমি শুধু শুধু ভয় পাও। এই বিজ্ঞানের যুগে কেউ ভূত প্রেত বা অশরীরি বিশ্বাস করে? আমার আম্মুর ওপর খুব রাগ হতো। এত সুন্দর বাড়ি ছেড়ে শুধু যেতে চায় কেউ?

এক শ্রাবণ মাসের দুপরবেলা আমার সবাই খেতে বসেছি। হাওড় এলাকায় শ্রাবণ মাস বোঝা খুব সহজ। যখন তকন আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামত। আকাশ কালো হলে হাওড়ের পানিও কালো দেখাতো। সেদিন ছিল শুক্রবার। আব্বুর অফিস ছিল না। আমরা সবাই খাচ্ছিলাম হঠাৎ আমার ছোট বোন তিথির গলায় মাছের কাঁটা ফুটল। আম্মু ওকে ভাত দলা করে খাওয়ালো। লেবু খাওয়ালো, কিন্তু কিছুতেই কাঁটা নামলো না। বিকেল বেলা তিথির অবস্থা আরও খারাপ হলো। ওর গলা ফুলে গেল। বমি করতে করতে তিথি করুণ চোখে চেয়ে রইলো। আম্মু তিথিকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে শুরু করলো। আশপাশে কোনো ডাক্তার বা হাসপাতাল ছিল না। হাসপাতাল ছিল বিশ মাইল দূরে। আব্বু ঠিক করলেন নৌকায়করে তিথিকে নিয়ে যাবেন হাসপাতালে। সন্ধ্যার পর থেকে আকাশ কালো করে শুরু হলো ঝড়।

এ ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে আব্বু আর আম্মু তিথিকে নিয়ে যাত্রা করলো। তখন আমার প্রথম সাময়িক পরীক্ষা চলছিল। পরের দিন আমার ইংরেজি পরীক্ষা তাই আমাকে বাসায় থেকে যেতে হলো। আমার সাথে থেকে গেল আমাদের কাজের মেয়ে জরিনার মা। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। আমার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল আব্বু আম্মুর সাথে যাই। জরিনার মা ছিলেন ঘুম কাতুরে। বিছানায় শোয়া মাত্রই ঘুম। আমার আবার তার উল্টো অবস্থা।

ঘুম আসছি না তাই চোখ বন্ধ করে শুয়েছিলাম। রাত তখন আনুমানিক বারোটা।

প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল থেমে থেমে।

বিদ্যুতের আলোতে আমার মনে হলো দরোজার বাইরে কেউ একজন দাঁড়িয়ে।

শাড়ি পরা তবে মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। নূপুরের মৃদু শব্দ পাচ্ছিলাম। আমি কয়েকবার বললাম কে, কে? কেউ উত্তর দিলো না। নূপুরের শব্দও থেমে গেল। যে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল একটু সরে গেল। কিন্তু একবারে চলে গেল না।

আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। দেখলাম ২২-২৩ বছরের এক মেয়ে দাঁড়িয়ে। এই অন্ধকারে বয়স বোঝার উপায় নেই কিন্তু আমার মনে হলো এর বয়স ২২-২৩-এর বেশি না। আমি মোম হাতে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে মেয়েটি পেছন ফিরে হাঁটা শুরু করলো। মেয়েটি হেঁটে হেঁটে দোতলায় চলে গেল। আমিও কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পেছনে পেছনে গেলাম।

এ রকম ভর-বৃষ্টির রাতে এত বড় বাড়িতে দুটি মাত্র প্রাণী। আমি আর জরিনার মা। আমি ছোটবেলা থেকেই একটু সাহসীই ছিলাম। তাই মেয়েটার পেছনে পেছনে ছাদের দিকে যাচ্ছি আমার হাতে

একটা মোমবাতি। গল্প সিনেমায় দেখেছি ভূত-প্রেতরা আগুন ভয় পায়, সাদা কাপড় পরে থাকে। কিন্তু আমি যার পেছনে যাচ্ছি একে আর যাই হোক ভূতটুত মনে হলো না। যে শাড়িটা পরেছিল সেটাও সাদা না। কচুপাতা কালারের পাড়গুলো লাল। মেয়েটি হাঁটার সাথে সাথে নূপুরের মৃদু রিনিঝিনি শব্দ হচ্ছিল। শব্দটার মাঝে এক ধরনের মাদকতা আছে। আমার মনে হলো এ শব্দ পার্থিব কোনো শব্দ নয়। অন্য কোনো জগতের অন্যকোন ভুবনের। যা শুনলে যে কেউ আনমনা হতে বাধ্য। আমি ভূত প্রেত বিশ্বাস করি না। আমার বিশ্বাস এ মেয়েটি হয়তো ঝড়ের কারণে এ বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। আমি মেয়েটিকে আবার ডাকলাম 'এই যে, আপনি কে?" এবারও কোনো জবাব এলো না। মেয়েটি শুধু পেছনে ফিরে তাকালো একটু। বিদ্যুতের আলোতে দেখলাম মেয়েটি চোখ দুটো অসম্ভব সুন্দর। কিন্তু চোখ কী এক বিষাদের ছায়া। হঠাৎ দমকা বাতাসের সাথে এক পশলা বৃষ্টি এসে আমার মোমবাতিটা নিভিয়ে দিল। চোখে মুখে পানির ঝাপটা পড়াতে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। আমি দেখলাম আমি ছাদের একেবারে কিনারে দাঁড়িয়ে আছি। আর হয়তো আধা ইঞ্চি সামনে এগুলোই নিচে পড়ে যাব। প্রচণ্ড ভয় আমার সমস্ত ইন্দ্রীয়কে গ্রাস করলো। আমি চারদিকে তাকিয়ে দেখি মেয়েটি কোথাও নেই। আমি নিজে নিজেই কয়েকবার ডাকলাম 'তুমি কোথায়? আমাকে শুনতে পাচ্ছ?'

আমার নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কাছেই অচেনা লাগলো।

হঠাৎ একটা শীতল হাত আমার পিঠে অনুভব করলাম। প্রচণ্ড ভয়ে জ্ঞান হারাবো এমন সময় জরিনার মা বলল, "তুমি এত রাইতে ছাদে কিতা করুনই।"

"চল নিচে ঘুমাইবাইন" আমি জরিনার মার পিছনে পিছনে ফিরে আসছি। আমার মোমবাতি আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে জরিনার মা।

আমি মোম হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। জরিনার মা আগে আগে যাচ্ছে।

মোমের আলোতে বারান্দায় কি যেন চকচক করছে। কাছে গিয়ে দেখি একপাটি নূপুর। নূপুরটি আমার খুব পরিচিত মনে হলো। কিন্তু এ বাড়িতে কেউ নূপুর পরে না। কারণ বাবা নূপুর খুব অপছন্দ করেন। যুক্তির খাতির যদি বলি নূপুরটি মেয়েটির সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ মানুষ মরে ভূত হতে পারে কিন্তু নূপুর তো আর মরে ভূত হবে না।

রাক্ষস রুপী ভূত

তাহ্‌সিয়া রাবার তানিশা
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২২
শাখা : ক, শিফট : দিবা

ঈদের ছুটিতে রোদেলা মায়ের সাথে বেড়াতে আসে মামার বাড়িতে। রোদেলার ছোট মামার নামি শিপন, শিপন খুব সাহসী ছেলে। রোদেলা ছোট মামার খুব ভক্ত। বেড়াতে আসলেও অধিক সময় ছোট মামার সাথেই কাটায়। যদিও রাতে মায়ের সাথেই ঘুমাই কিন্তু এবার তার ব্যতিক্রম ঘটল। রাতে খানাপিনার পর্ব শেষ হলেও শিপনের ঘরে এস শিপনকে বললো, ছোট মামা, আজ আমি তোমার সাথে ঘুমাবো। শিপন বললো, হ্যাঁ, মা বলেছে তোমার সাথে ঘুমাতে। শিপন বললো, তাহলে শুয়ে পর। রোদেলা শিপনের পাশে বসে বললো তার আগে আমাকে তোমার গল্প শুনতে হবে। শিপন জিজ্ঞেস করলো, গল্প? কিসের গল্প? রোদেলা বললো, ভূতের গল্প। আচ্ছা ছোট মামা, তুমি কি কখনো ভূত দেখেছো? শিপন বললো, শুধু দেখিনি, মেরেছিও। রোদেলা বলে, বলো কী ছোট মামা, তুই ভূত মেরেছো? শিপন বললো, তাহলে আর বলছি কী? রোদেলা বললো, কিন্তু ভূতেরা তো খুব ভয়ঙ্কর হয়ে আছে। ভূত দেখলে নাকি মানুষ ভয় পায়। তুমি পাওনি? শিপন বললো, ভয়তো পায় ভীতু লোকেরা। আমি তো আর ভীতু নই। রোদেলা বললো, বলো তো শুনি কিভাবে তুমি ভূত মারলে। শিপন বললো, শোন বলছি, আমাদের লিচু গাছটাতো চেন? গত বছর লিচুতে যখন পাক ধরেছে, তখন তোমার নানা, আমাকে বললেন, লিচু বাগান পাহারা দেবার জন্য। রোদেলা বললো, পাহারা দিতে বললেন, কেন? শিপন বললো, পাহারা না দিলে রাতের বেলায় কাঠ বিড়ালি, বাদুড় পাখি সব লিচু খেয়ে ফেলবে। এমনকি গাঁয়ের দুষ্টু ছেলেরা মিলে সব লিচু চুরি করে নিয়ে যাবে, তাই রোদেলা বললো ও আচ্ছা। তারপর বলো ভূত মারলে কিভাবে? শিপন বললো, সে কথাইতো বলছি। তোমার নানার কথামতো আমি লিচু বাগান পাহারা দেবার জন্য সেখানে। বাঁশ দিয়ে একটা মাচা তৈরি করলাম। রাতের বেলায় হারিকেন জ্বেলে সেখানে বসে রাত জেগে বাগান পাহারা দেই। রোদেলা বললো, তুমি একা? শিপন বললো না, আমার সাথে থাকতো তোমার পটল মামা। পটল হলো শিপনদের পাশের বাড়ির ছেলে। রোদেলা বললো, তারপর? শিপন বললো, তারপর একদিন তোমার পটল মামা বাড়িতে ছিল না। সেদিন আমি একাই গেলাম বাগান পাহারা দিতে। আমার হাতে ছিল আড়াই হাত লম্বাব একটা শক্ত বাঁশের লাঠি। আমি বসে থেকে বাগান পাহারা দিচ্ছি। এগিয়ে গেলাম। কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পেলাম না। কাছে যেতেই শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল। আমি আবার মাচায় এসে বসলাম। খানিকপর দেখতে পেলাম, একটা কুৎসিত চেহারার লোক, মাথায় এলোমেলো চুল, বিস্ফোরিত দুটো চোখ, হাতে লম্বা লম্বা নখ, দাঁতগুলো রাক্ষসের মতো। পরনে ছেঁড়া কাটা কালো জামা। আমার দিকে রাক্ষসের মতো এগিয়ে আসছে আর বলছে, অনেক দিন পর তাকে বাটে পেয়েছি, আজ আর ছাড়ছিনে। আমি বুঝতে পারলাম, এটা ভূত ছাড়া আর কিছু নয়। হাতের লাঠিটা শক্ত করে ধরলাম, আমার কাছে আসতেই আমি গায়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে লাঠি দ্বারা তার মাথায় আঘাত করলাম। সাথে সাথে একটা চিৎকার শোনা গেল। পরক্ষণে দেখি ভূত নেই। আমার পাশে মরে পড়ে আছে একটা রক্তাক্ত কাক। রোদেলা বললো, কাক! শিপন বললো, হ্যাঁ, কাক। বোধ হয় ভূতটাই মরে কাক হয়ে গেছে। রোদেলা বললো, তোমার তো দারুণ সাহস ছোট মামা! অন্য কেউ হলে তো ভূতটাকে দেখে ভয়েই মরে যেত, তাই না? শিপন বললো, হয়তো তাই। এসো এবার ঘুমানো যাক। বলে শিপন শুয়ে পড়ল, সাথে রোদেলাও।

কাঁকড়া ও বকের গল্প

মোসাঃ সানিয়া আক্তার
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৫৩
শাখা : ক, শিফট : দিবা

বড় এক নদী। সেই নদীর কিনারা ঘেঁষে এক গর্তে থাকে একটি মা কাঁকড়া আর তার একমাত্র ছেলে। ছেলের বাপকে কয়েক মাস আগে এক খারাপ লোক কোঁচ দিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ধরে নিয়ে গেছে। মা কাঁকড়া এজন্য হাহুতাশ করে। ছেলেও বাপের কথা মনে পড়লে মুখ গোমরা করে বসে থাকে। ছেলের বাপ নেই। এখন তো তাকে ভালোভাবে গড়ে তোলা আর আদব-কায়দা শেখানোর দায়িত্ব মায়েরই। মা এটা ভালোভাবেই জানে এবং মনে রাখে। তাই সে ছেলেকে এটা শেখায়। সেটা পড়ায়। কত কী করে। একদিন হয়েছে কী মা কাঁকড়া গর্তের মুখে বসে আছে। এমন সময় দেখে একটা দাঁড়বক, মানে বড় সাইজের বক। ধবধবে সাদা পালক তার সারা গা জুড়ে। যেমন তেলতেলে তেমন সুন্দর। নদীর কিনারা বরাবর অল্প পানিতে হেঁটে হেঁটে মাছ ধরছে। কেমন টান-টান শরীর। মাথা উঁচু করে হাঁটছে। কাঁকড়াদের মতো একটুও গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটছে না। যেন শহর থেকে আসা এক ভদ্দর সাহেব। মা কাঁকড়া বককে যত দেখে মুগ্ধ হয়। মনে মনে ভাবে আহারা! আমার বাবুটা যদি ওমন সুন্দরভাবে, ঘাড় উঁচু করে হাঁটতে পারত! এমন সময় র্গ থেকে বেরিয়ে আসে বাচ্চা কাঁকড়াটা। ছেলেকে দেখেই মা বলে– দেখ, বাবা দেখ্ কেমন ফকফকে বদ্দরনোক। এই বলে সে বককে দেখায়। ছেলে তখন বলে– 'মা, ভদ্দনোক কোথায়? ও তো বক। ভারি গাড়ল। খালি ধরে ধরে মাছ খায়। ভদ্দরলোকেরা কি অত গাড়ল হয়? অমন গপাগপ্ মাছ গেলে? ছেলে কথা শুনে মা রেগে যায়, বলে– তুই খালি ওর মাছ খাওয়াই দেখলি? কেমন বাবুর মতো বুক টান টান করে, মাথা উঁচু করে হাঁটে তা দেখলি না? শোন, আমি তোকে ওর মতো বাবু আর ভদ্দনোক বানাবো। তুই যেভাবে থেবড়ে থেবড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটিস, তা দেখতে এক্কেরে ভাল্লাগে না। তুই ও বকের মতো মাথা উঁচু করে, বুক টান করে হাঁটবি। আমি দুইচোখ ভরে দেখব... আর দেখব। মায়ের কথা শুনে ছেলে বলবে ভেবে পায় না। তখন ছেলেকে সে ধামকি দিয়ে বলে– আর ভাবতে হবে না। বককে দেখে শেখো। তারপর সেইভাবে হাঁটা প্র্যাকটিস্ করা। ছেলে আর কী করে। অগত্যা মায়ের কথামতো বকের মতো হাঁটার চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। যে-ই না সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, ওমনি ঢলে পড়ে যায় মাটিতে। কিছুতেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। হাঁটাতো আরও পরের কথা। এভাবে কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ছেলে কাঁকড়া একেবারে হাঁফিয়ে ওঠে। সে ঘামাতে ঘামাতে বলে– না মা, এ আমাকে দিয়ে হবে না। মা কাঁকড়া তখন সুর করে ছড়া কাটে :

পারিব না এ কথাটি বলিও না আর,
কেন পারিবেনা তাহা ভাবো একবার।
বকেরা পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা;
একবার না পারিলে করো বারবার।

মায়ের মুখে চমৎকার ছড়া শুনে ছেলের উৎসাহ বেড়ে যায়। সে আবারও মোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু যে কে সেই। আবারও কুপোকাত। এবার পড়বি তো পড়, একেবারে মায়ের গায়ের ওপর। মা কোনো রকমে ছেলেকে সামলায়। তারপর বলে– তুই একটা অপদার্থ। একটা রামপাঁঠা। একটা হাঁসের ছাও। একটা ভীতু মুরগির আন্ডা। বক মাত্র দুই পায়ে এমন সুন্দর দাঁড়াতে পারে, হাঁটতে পারে। আর তুই দশ পায়ে কিছুই পারিস না! মায়ের কথায় ছেলে ভারি লজ্জা পায়। শেষমেষ মাকে বলে– মা, তুমি আমাকে একটু শিখিয়ে দাও না। তাইলেইতো ভালো হয়। তোমার দেখাদেখি আমি চেষ্টা করতে পারি। তখন মা বলে ভালো কথা বলেছিস বাবু। দাঁড়া, আমিই তোকে ভদ্দরনোকের মতো হাঁটা শিখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে মা সেই সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেছে, দেখে সেও পারছে না। কয়েকবার চেষ্টা করল। বারবারই সে হুড়মুড় করে পড়ে গেল। তখন সে ছেলেকে বলে– ঘোড়ার ডিম! মাথায় কাজ করছে না রেবাবু। হাত-পাও দুশমনি করছে। ঠিক আছে। চল আমার সাথে, বকের কাছেই যাই। সেতো আসল ভদ্দরনোক। সেই তাকে একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবে।

মা কাঁকড়া তার ছেলেকে সাথে নিয়ে বকের কাছে যায়। তাকে সে বকের মতো হাঁটা শিখিয়ে বলে। বক তখন হাসবে না কাঁদবে, নাকি ফিট খাবে কিছুই বুঝতে পারে না। একটা পুঁটিমাছ কেবল ধরেছিল, সেটা পেটের মধ্যে চালান করে দিয়ে সে পণ্ডিতের মতো করে বলে দেখো মাসী, সবাইকে দিয়ে সব কাজ হয় না। তোমাদের দশ পা। আমার দুই পা। তোমরা গর্তে লুকাতে পারো। আমি পারি না। তাই বলে কী আমি তোমাদের মতো হতে পারলাম না বলে হাহুতুশ করব? এটা ঠিক না। খোদা আমাদেরকে এভাবেই বানিয়েছেন। আর এতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তুমি, আমি, বাবু আমরা সবাই সুন্দর। খোদার সৃষ্টি কী কখনও অসুন্দর হয়? বকের কথা শুনে মা কাঁকড়া আর তার ছেলের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। তারা খুশিমনে ফিরে যায় তাদের বাড়িতে।

জঙ্গলে বাঁশ কাটে এমন এক লোকের গল্প

আলিফা আলম
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৪৫
শাখা : ক, শিফট : দিবা

এক জঙ্গলে ছিল স্বামী এবং স্ত্রী। স্বামীটি প্রতিদিন বাঁশ কাটতে জঙ্গলে যায়। তারা দুজনে খুব গরিব। তারা দুজন বাঁশ দিয়ে অনেক কিছু তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে এবং তাদের পরিশ্রম করতে খুব কষ্ট হতো। তাদের ঘরে কোনো সন্তান ছিল না। কিন্তু তারা খুব সুখেই ছিল। একদিন লোকটা জঙ্গলে বাঁশ কাটতে যায়। বাঁশ কাটতে কাটতে সে মাঝে একটা বাঁশ দেখতে পেল। সে আস্তে আস্তে বাঁশটা কেটে ফেলল। তারপর হঠাৎ বাঁশটির ভেতর দেখে সেখানে সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। লোকটা তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। যেমন– লোকটার বুড়ো আঙ্গুলের মতো মেয়েটা। তখন তাকে আস্তে করে ধরে নিয়ে

গেল। যাতে মেয়েটা চাঁপা খেয়ে মরে না যায়। তারপর লোকটা বাড়িতে নিয়ে গেল। তারপর লোকটা বাড়ি গিয়ে তার স্ত্রীকে ডেকে এনে বলে, দেখ কি এনেছি। তার হাতটা খুলল এবং সঙ্গে সঙ্গে সারা বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল। তারপর স্ত্রীটি দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। লোকটা বলল ওর নাম হচ্ছে চন্দ্রপ্রভা। স্ত্রীটি বলল, বাহ্ কী সুন্দর নাম তার। তারপর লোকটির স্ত্রী তাকে একটা কাপড় দিয়ে তাকে শুয়ে দিল। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীটি জানালার সামনে মেয়েটাকে ধরে রাখল। কতক্ষণ পর বাইরে এক ঝালকা তুফান এলো। মেয়েটি উড়ে চলে যাচ্ছে ধরার চেষ্টা করল। তারপর লোকটির হাতে এলো এবং তার উপর লাল কাপটা পরে। কিছুক্ষণ পর মেয়েটা স্বাভাবিক চেহারায় পরিণত হলো। তখন তারা অবাক হয়ে গেল। কিছুদিন পর লোকটা আবার বাঁশ কাটতে গেল। বাঁশ কেটে দেখে বাঁশের ভেতরে সোনার লকেট দেখল। সে তুলে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে গেল। তার স্ত্রী দেখে অবাক হযে গেল। তারা দুজন দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। এবং কিছুক্ষণ পর তার স্ত্রী বুঝতে পারল যে চন্দ্রপ্রভা তার সাথে সৌভাগ্য নিয়ে আসছে। তারপর থেকে সে প্রতিদিন একটা করে সোনার লকেট নিয়ে আসত। কিছুদিন পর তারা বড় লোক হয়ে গেল। চন্দ্রপ্রভাকে ভালো ভালো খাবার ও দামি সিল্কের পোশাক এনে দিত। মাসের পর মাস কেটে যায়। ছোট্ট চন্দ্রপ্রভা তরতর করে বড় হয়ে যায়। তার ছোট দুটো ঝিকিমিকি তারার মতো জ্বলছে এবং তার সিল্কের জামা থেকে তার চুল যেন অনেক রেশমি। তার হাসি চাঁদের মতো উজ্জ্বল। কিন্তু তার বাবার খুব চিন্তা হচ্ছে। কারণ গ্রামের অনেক লোকেরা বলে এই মেয়েটাকে কোথা থেকে পেয়েছেন। তার বাবা বলে আমি ওকে জঙ্গলে পেয়েছি একাকি। তারপর তার স্ত্রীকে ভালোভাবে কথা বুঝিয়ে বলল, এবং স্ত্রী বলল, এখন ওর রূপ নিয়ে কানাঘুষা করছে। কিছুক্ষণ পর তার বাবা মেয়ের ঘরে এসে বলল, মা তুই বিয়ে কর। কিন্তু চন্দ্রপ্রভা বলে বাবা আমি তোমাকে ছাড়া থাকতে পারব না। বাবা বলে ও আমার সোনা মা, আমিও তো তোকে ছাড়া থাকতে পারব না। কিন্তু ৫-৬টি ছেলে দেখো না। চন্দ্রপ্রভা তার বাবাকে খুব ভালোবাসে, তার জন্য মানা করতে পারল না। তারপর তার বাবা পরের দিন ৫ জন লোকের সাথে দেখা করতে বলল। তার মেয়ে দেখা করতে এলো। পাঁচ জন লোক দেখে অবাক হয়ে গেল। প্রথম জন বলল, আমি তোমাকে অমাবর্ষের চাঁদ এনে দিতে পারি। দ্বিতীয় জন বলল পারলে আমি তোমাকে ঝিকিমিকি তারা এনে দিতে পারি। তৃতীয়জন বলল, আমি তোমাকে সমুদ্রের মুক্তা এনে দিতে পারি। মেয়েটা বলল আমার না মুক্ত, ঝিকিমিকি, তারা না চাঁদ্ আমি যা বলব ঠিক সেটাই এনে দিতে হবে।

প্রথম জনকে বলল আমাকে পৃথিবী একমাত্র গুরুর কাছ থেকে আমার জন্য একটা পাথরের বাটি এনে দিন। যা আমার থেকেও চকচকে হয়। দ্বিতীয় জনকে বলল, আমাকে একমাত্র উঁচু পাহাড় থেকে একটা লম্বা গাছ দেখতে পাবে যার নিচে লোহা দিয়ে ও পুরোটা স্বর্ণ দিয়ে তৈরি। নকল ঢাল এনে দিয়ে আপনি আমার অপমান করবেন না। তৃতীয় জনকে বলল, ড্রাগনের মাথায় একটা সাত রঙের ডাইমন্ড আছে তা এনে দিন। চতুর্থজনকে বলল, একটা ইঁদুরের আগুনের জোব্বা এনে দিন। পঞ্চম জনকে বলল, সলো পাখির পেটে একটা মুক্ত এনে দিন। আপনাদের এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ।

মাসের পর মাস কেটে যায় কেউ আর ফিরে এলো না। একমাত্র সে পাড়ল যাকে গুরুর কাছ থেকে চকচকে পাথর আনতে বলল। কিন্তু চন্দ্রপ্রভা তার কাছে ফিকে। তাকে আর বিয়ে করল না। তার বাবা বলল, এমনকি কোনো ছেলে নেই যা আমার মেয়েকে বিয়ে করবে। কিছুক্ষণ পর পর বাড়িতে রাজা এলো। তার বাবা বলে রাজা আসছে। রাজা বলে আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করার প্রস্তাব এনেছি। শুনেছি নাকি আপনার মেয়ে কতজনকে কতকিছু আনতে বলেছে তা নাকি আনেনি। আপনার মেয়ে যা চায় আমি তাকে তা এনে দিতে পারব। চন্দ্রপ্রভার বাবা বলল অপেক্ষা করুন আমি চন্দ্রপ্রভাকে ডেকে আনছি। রাজা ভয়ে ভয়ে অপেক্ষা করছে। তারপর চন্দ্রপ্রভা এসে বলল, হে মহান রাজা আমি আপনার কাছ থেকে যা চাই, ঠিক সেটাই দিতে হবে। আমি বিয়ে করব না। তার কারণ আপনি জানতে চাইবেন না। রাজা বলে ঠিক আছে। আমি তোমার থেকে কিছু চেতে পারি, তুমি কি আমার ভালো বন্ধু হতে পার। সে বলে নিশ্চয়ই। রাজা বাড়ি থেকে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর চন্দ্রপ্রভাব জানালার সামনে বসে বসে কাঁদছে। চন্দ্রপ্রভার বাবা এসে বলে কি হয়েছে মা? তুই কাঁদছিস কেনো। চন্দ্রপ্রভা বলে, বাবা আমি স্বপনে দেখেছি, যে আমাকে চাঁদের লোকেরা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল ১৫ তারিখে আমাকে তুলে নিয়ে যাবে। আমি তোমাদের দুজনকে ছাড়া থাকতে পারব না। সঙ্গে সঙ্গে রাজার কাছে চিঠি পাঠাল এবং রাজা ২ হাজার সেনাপতিকে চন্দ্রপ্রভার ঘরের বাইরে রেখে দিল। কিছুক্ষণ পর চাঁদ থেকে কয়েক মেয়ে এলো চন্দ্রপ্রভাকে নিতে। বাঁশির সুরের সাথে চন্দ্রপ্রভা ঘর থেকে উড়ে বাইরে এসে পড়ে। পরীরা লাঠি যাদুর সাথে চন্দ্রপ্রভাকে অনেক সুন্দর জামা পরিয়ে দিল। সে নিচে নেমে বলল, মা এবং বাবা আমাকে এখন যেতে হবে। আমাকে ছাড়া চাঁদ এখন অসম্পূর্ণ। তার মা-বাবা বলে তার মানে তুমি এখন আমাদের সাথে থাকবে না। চন্দ্রপ্রভা বলে একমাত্র যেদিন আমি তোমাদের বাসায আসব যেদিন পূর্ণিমার রাত। রাজা চন্দ্রপ্রভাকে বলল, তাহলে আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। চন্দ্রপ্রভা বলল, আমিও। তারপর চন্দ্রপ্রভাব চলে যাচ্ছে। চন্দ্রপ্রভা একটুও মন খারাপ করল না, কারণ সেখানে থেকে সবকিছু দেখতে পাবে। তারপরে তারা দুইজন ঘরটাকে পুরনো কুটিরে বদলে দিল। এবং তারা সুখে বসবাস করতে থাকল। গল্প শেষ।

স্বাধীনতার কথা

জাকিয়া ইসলাম
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৫৪
শাখা : খ, শিফট : দিবা

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ করা হয়। এই দেশ ভাগ করার পর পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ বাঙালির ওপর অত্যাচার চালায়। এই নিয়ে অনেক আন্দোলন হয়ে যায়। পরে ১৯৭১ সালে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ দেন। এই ভাষণে সবাই জেগে ওঠে। ২৫শে মার্চ রাতে এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানির ভয়ঙ্কর গণহত্যা চালায়। কত নরনারী শিশু গেল মারা। সেই সঙ্গে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্দু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়। শুরু হয়ে যায় মুক্তিযুদ্ধ। কত যুবক সমাজ, দেশের নানা পেশাজীবী মানুষ যোগ দেয় মুক্তিযুদ্ধে। কত মানুষ না খেয়ে মারা যায়। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দেয় হানাদাররা। কত মানুষ জায়গা-জমিন ছেড়ে চলে গেছে এদেশ থেকে ওদেশে। হানাদারদের অত্যাচারের সাথে ছিল এদেশের রাজাকাররা, আলবদর, আলশামস। অনেক সহাসী এদেশের মানুষ। তারা কিছুতেই হাল ছাড়েনি। বঙ্গবন্ধুর ডাকে তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চলল সে যুদ্ধ। এ যুদ্ধে ৩০ লক্ষ মানুষ শহীদ হয়েছিল। অবশেষে জয়ী হয়ে গেল এদেশের মুক্তিযোদ্ধারা। জয়ী হলো এদেশের মানুষের স্বপ্ন দেখা স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে পেলাম স্বাধীন দেশ।

আমার প্রিয় বাংলাদেশ।

আমার প্রিয় জন্মভূমি।

মায়ের রূপ ধরে পেত্নি

ইসমা জাহান মুমতাহিনা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৭
শাখা : খ, শিফট : দিবা

বরিশাল জেলার এক পরিত্যক্ত গ্রাম। সেখানে বাস করত এক সুখী পরিবার। সেখানে ছিল এক পুরনো তেঁতুল গাছ। সেই পরিবারের এক সদস্য ছিল নাঈম। তার মা নাঈমা আক্তার ছিলেন একজন গৃহিণী। তার বাবা নাফিস রহমান একজন ফল ব্যবসায়ী। তাদের সাথে তাদের বাবা-মাও বাস করতেন।

একদিন নাঈমার মা সন্ধ্যাবেলা পুকুর ঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তার মাথায় কাপড় খুলে গিয়ে চুলের খোঁপা খুলে যায়। তখনই এক দমকা বাতাস বয়ে যায় এবং সাথে সাথেই নাঈমা অজ্ঞান হয়ে যান। অনেকক্ষণ পর তার জ্ঞান ফেরে। জ্ঞান ফেরার সাথেই সে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে যায়। খাটের কোণে থাকা লাঠিটা নিয়ে সে সাথে সাথে বারকয়েক আঘাত করে নাঈমের মাথায়। মারার সাথে সাথে সে আবারও অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

আরেকদিন বিকেলবেলা নাঈম তার বন্ধুদের সাথে খেলছিল। হঠাৎ করে তার মা বাড়ির উঠানে পড়ে থাকা খেজুর কাটা নিয়ে দৌড়ে গিয়ে নাঈমকে মারতে শুরু করে। বেধড়ক মারার পর সে সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে। পরে তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে নেওয়া হয়। আর নাইমকে পাঠানো হয় হাসপাতালে।

একদিন নাঈমের দাদি দেখে তার বৌমা পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে। কিন্তু সে তার আসল রূপে নেই। সে এখন হয়ে গেছে এক পেত্নি। আর তার বৌমা তার পাশে মরার মতো শুয়ে আছে। এটা দেখে সে সাথে সাথে ওঝাঁ ডেকে আনতে যায়। কিন্তু ওঝাঁ সেদিন বাড়িতে ছিল না। তাই তাকে ফিরে আসতে হলো।

এর কিছুক্ষণ পর মায়ের রূপ নেয়া পেত্নি নামাজ পড়তে গেল। নাঈম তার মায়ের সামনে বসে পড়ছিল। হঠাৎ সে নামাজ ছেড়ে দিয়ে তার পাশে থাকা এক চেলা কাঠ দিয়ে এমন জোরে আঘাত করে যে নাঈমের মাথা কেটে রক্ত আসা শুরু করে। তখন সেই পেত্নি অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে এবং তখনই নিজের রূপে ফিরে আসে। হঠাৎ তখনই সেই ওঝা হাজির। সাথে সাথে নাকের সামনে পোড়া হলুদ ধরে চুলের মুঠি ধরে মন্ত্র পড়া ঝাড়ু দিয়ে তাকে মারতে শুরু করে। তখনই পেত্নিটা সব গড়গড় করে বলতে শুরু করে। সে বলে, আমি ঐ পাশের তেঁতুল গাছের পেত্নি। আমার স্বামী মরার অনেক আগে এই তেঁতুল গাছটা লাগিয়েছিল। সে মরার আগে আমাকে বলেছিল এই তেঁতুল গাছটা দেখে রাখতে। যতদিন আমি বেঁচে ছিলাম ততদিন এটার খেয়াল রেখেছি। মরার পরও খেয়াল রাখছি পেত্নি হয়ে। হঠাৎ একদিন এই ছোট্ট বদমায়েশ ছেলেটা তেঁতুল গাছে উঠে তেঁতুল পেরে খেতে লাগল। সাথে ছিল তার মাও। তাই আমি তার মায়ের শরীরে ঢুকে বদমায়েশ ছেলেটার মাথা ফাটিয়েছি।

আমি সব বলেছি। এবার আমার চুল ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও।

ওঁঝা বলল, ঠিক আছে তাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তবে আর কখনও এরকম করবি না। নয়তো তোকে শেষ করে ফেলবে।

এরপর থেকে ওরা সবাই সুখে-শান্তিতে বাস করতে লাগল।